পঞ্চম অধ্যায়

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব
- বিশ্লেষণী পাঠ

আমাদের দেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে ধর্ম প্রচারের জন্য। তারা এই দেশে ধর্মীয় কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছিল অষ্টাদশ শতক থেকেই। খ্রীষ্টান মিশনারীরা নিজের ধর্ম প্রচার করার জন্য হিন্দুধর্মের নানা সমালোচনাও করত। তাদের এই সমালোচনাতে এক শ্রেণীর মানুষ রাগ প্রদর্শন করতেন। আর এক শ্রেণীর মানুষ সমাজের কু-সংস্কার দূর করার প্রেরণা পেয়েছিলেন। উনিশ শতকে যে নানা সামাজিক কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছিল এবং নবজাগরনের যে আন্দোলন সংগটিত হয়েছিল তাতে মিশনারীদের কার্যকলাপ একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে।

রামমোহনের চেষ্টাতেই প্রথম বাংলাদেশে কু-সংস্কার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তিনি ছিলেন সতীদাহ প্রথা নিবারণের একমাত্র পথ প্রদর্শক। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভাতে অন্যান্য কু-সংস্কার নিয়ে যে আলোচনা হত না তাও নয়। সামাজিক কু-সংস্কার নিয়ে যেমন আলোচনা হত তেমনি বিধবাবিবাহ নিয়েও আত্মীয় সভাতে আলোচনা হত। বিধবা রমণীর প্রতি রামমোহনের সহানুভুতি ছিল অপরিসীম। আর তাঁর বিধবা রমণীর প্রতি সমবেদনা, সহানুভুতি বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে বেশ সাহায্য করেছিল, একথা আমরা বলতেই পারি। রামমোহনের সতীপ্রথা নিবারণ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের যদিও কৈশোর চলছে তবুও তিনি রামমোহনের প্রভাবেই সমাজ সংস্কার আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

বাংলাদেশে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীই প্রথম বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিল। তারা বিদ্যাসাগরের পূর্ব থেকেই বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনকে একটা গতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকেই বাঙালি হিন্দুরা বিধবাবিবাহের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ এর প্রথম সংখ্যাতে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল যে একজন পুরুষ যদি স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার

বিবাহ করতে পারেন, তবে একজন নারী স্বামী মারা গেলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবেনা কেন। ১৮৪৯ এর 'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে জানা যায় হিন্দু বিধবাদের পুর্নবার বিবাহ নিয়ে কিছু কিছু যুবকদের মধ্যেও নানা আলোচনা চলছিল। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরা বিধবাবিবাহকে মেনে নিতে পারতেন না। 'সম্বাদ ভাস্কর' এর সম্পাদক ছিলেন গৌরীশংকর, তাঁর ধারণা ছিল বিধবাবিবাহ একদিন না একদিন প্রচলিত হবেই। তিনি প্রচীন হিন্দুদের আহ্বান জানিয়ে বলেন-

> "প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা এই সময় শাস্ত্রীয় প্রমানানুসারে নিয়ম বদ্ধ করিয়া যদি বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন তবে তাহাদিগের বংশাবলীকে উত্তরকালীন আপদ হইতে মুক্ত করিয়া যাইবেন।"[১]

গৌরীশঙ্করের এই আহ্বানে প্রাচীন হিন্দুদের যদিও টনক নড়েনি, কিন্তু এ কাজের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সে যুগের অনেকেই মনে করতেন যে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় কাজ। বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র উত্থাপন করে তা শাস্ত্রীয় বলে প্রমান করার চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন যেমন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজের কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন বিদ্যাসাগরও সেই রাস্তা অবলম্বন করেছিলেন। স্বপন বসু তাঁর 'সমকালে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছেন-

> "বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' মনে করতেন। এর জন্য একদিকে তাকে যেমন অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল, অন্যদিকে এই আন্দোলনের সুত্রে শহরের গন্ডি ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জে সাধারন মানুষের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।"[২]

বিদ্যাসাগর একদিকে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ করছিলেন, অন্যদিকে নবযুবকের দল তা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই নবযুবকদের উৎসাহ দেখে তাদের সাফল্য কামনায় সংবাদ প্রভাকর একটি কবিতা প্রকাশ করে-

" কয়জন জ্ঞানিবাবু ভ্রমনিদ্রা হত।
বিধবার বিয়ে দিতে হয়েছেন রত।।
মনখুলে আশীর্বাদ করিতেছি সবে।

বাবুদের অভিলাষ পরিপুর্ণ হবে।।"[৩]

বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে ১৮৫৩ সালে প্রায় তিনটি সভা হয়েছিল। তিনটি সভাতেই যতজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন সকলের মধ্যেই বিধবাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বিধবাদের জন্য মনে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও সমাজের ভয়ে অনেকেই আবার বিধবার বিবাহকে মেনে নিতে পারেন নি। ১৮৫৩ সালে ২৯ অক্টোবর তারিখে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে যে সভা বসেছিল, সে সভায় বিধবা বিবাহকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে সে সভারই কয়েকজন সদস্য বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন এমনকি রাধাকান্ত দেবও।

একদিকে বিধবাবিবাহ নিয়ে নানা উদ্যোগ আড়ম্বর চলছে, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর খুঁজে পেলেন পরাশর সংহিতার একটি বিখ্যাত বচন। এই বচনের সাহায্যেই তিনি বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা প্রমান করার জন্য ১৮৫৫ সালে জানুয়ারী মাসে প্রকাশ করলেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। পুস্তকটির প্রথমেই বিদ্যাসাগর লিখেছেন-

> "বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষনে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্যেগী আছেন। অনেকে ততদূর পর্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না; কিন্তু এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।"[৪]

এই পুস্তকটি প্রকাশের পর পুস্তকটির পক্ষে ও বিপক্ষে নানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বিপক্ষের সংখ্যাই ছিল বেশী।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পূর্বেও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য নানা চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর কোনো মীমাংসা ঘটে নাই। সে সময় বিধবাবিবাহ নিয়ে নানা লেখা লেখিও হত। তাঁর মধ্যে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এর প্রকাশিত 'বিধবার পুনর্ব্বিবাহ' রচনাটির উল্লেখ করতেই হয়। ১৮৪২ সালে এপ্রিল মাসে রচনাটি একজন পত্রপ্রেরকের কাছ থেকে পাওয়া যায়। অজ্ঞাতনামা এই পত্রদাতার বক্তব্য ছিল –

> "নারদ শঙ্খলিখিত বা অন্যান্য কয়েকজন ঋষির শাস্ত্রে ব্যবহাত 'পূনর্ভূ' শব্দের ব্যবহারে বোঝা যায় বিধবার বিবাহ তখন অপ্রচলিত ছিল না।"[৫]

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে এবং প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত আইন দ্রুতগতিতে তার লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ হয় ।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে বিদ্যাসাগর যে কতবড় সৎকর্ম বলে মনে করতেন তা বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখা একটি পত্র থেকেই অনুমান করা যায়। তিনি লিখেছিলেন-

> "বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না।"[৬]

সমাজের মঙ্গলের জন্য সমাজকে ব্যভিচার থেকে মুক্ত করতে সমাজের মানুষকে উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর নানা সংস্কার ধর্মী কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তার মধ্যে বিধবাবিবাহই প্রধান। যার জন্য তিনি নিজের পুত্রের বিধবাবিবাহকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিদ্যাসাগরকে আক্রমন করেছিলেন। অনেক বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে তাকে নানা অযৌক্তিক আক্রমন করে পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের সেই নীচু মনোভাবের জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর শাস্ত্র সংহিতা স্মৃতি থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে তাদের হীন মনোভাবের জবাব দিতে গিয়ে প্রকাশ করলেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না-এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৫৫ সালেরই অক্টোবর মাসে।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক খানি প্রকাশিত হবার পরই সারা দেশে আন্দোলনের সূচনা হয়, অনেকেই বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নানা কটুবাক্য বলতেও পিছপা হন নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর কটুবাক্য শুনেও থেমে না থেকে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তারপর বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গরাও বিধবা বিবাহ আইন পাস করার জন্য আবেদন করলেন। সেই আবেদন পত্রটিতে বিদ্যাসাগরের পক্ষে পঁচিশ হাজারেরও বেশী ব্যক্তি সই করেছিলেন। আবেদন পত্রের ব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় পাঠানো হয়। সে সময় রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির সই করা একটি বিধবা বিবাহ বিরোধী আবেদন পত্রও ব্যবস্থাপক সভায় পাঠানো হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকের প্রথমেই বলেছেন –

> "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এবিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্বাগ্রে এই বিবেচনা করা আবশ্যক যে এদেশের বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই; সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রবর্তিত করিতে হইবেক। কিন্তু, বিধবা বিবাহ যদি কর্তব্য কর্ম না হয়, তাহা হইলে কোনও ক্রমে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে, কারণ কোন ধর্ম পরায়ন ব্যক্তি অকর্তব্য কর্মের অনুষ্টানে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব বিধবা বিবাহ কর্তব্য কর্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমান, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বোতভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।"[৭]

বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদীদের মধ্যে প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় একজন। বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করে প্রসন্নকুমার একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন, তাঁর পুস্তকটি পাঠ করে রাখাল দাস নামের এক ব্যক্তি 'বিধবা বিবাহ অবশ্য প্রচলিত হওয়া

উচিত' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তকটি বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের প্রায় ছয় মাস পুর্বে প্রকাশিত, সেই পুস্তকটিতে রাখালদাস যে ভাবে বিরোধী পক্ষের যুক্তিকে খন্ডন করেছিলেন তা বিদ্যাসাগরের খুব পছন্দও হয়েছিল। পরাশর সংহিতায় বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে যে বচন দেওয়া ছিল তা মানতে চান নি প্রসন্নকুমার। তিনি বিধবা বিবাহকে প্রচলিত আচরন বলে মনে করেছিলেন। রাখালদাস তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, লোকাচার না মেনে যে যুক্তিকে সৎ বলে মনে হয় তাই আমাদের মেনে চলা প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের পর বাদবিতন্ডা তীব্র হয়ে ওঠে। ছড়া, গান, কবিতা, দেশের মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত, কোনটি পক্ষে আবার কোনটি বিপক্ষে।

বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের উত্থাপন করে বলেছিলেন যে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যে ধর্ম মানুষ পালন করে আসছিল, কলিযুগের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। মনু ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের কথা বলেছেন, কিন্তু ধর্মের কোনো যুগ স্থির করে দেন নি। এবং ধর্ম পালন করার জন্য কোনো শাস্ত্র অনুসরণ করতে হবে তা মনু বলেন নি। বিদ্যাসাগরের মতে কলিযুগে পরাশর সংহিতার বচনই পালনীয়, তিনি পরাশর সংহিতা থেকে বচন উদ্বার করে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত তা প্রমান করতে সচেষ্ট হন এবং সফলও হন। পরাশর সংহিতায় বিধবা বিবাহের পক্ষে বিধান দেওয়া ছিল-

> "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"[৮]

অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে, পতিত হলে, ক্লীব হলে স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারবে। পরাশরের এই বচনের দিকে লক্ষ রেখে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবার যে তিনটি কর্তব্য কর্মের কথা পরাশর বলেছেন তার মধ্যে প্রথমটিই বিবাহ। পরাশরের মতে বিধবার তিনটি কর্ম বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, ও সহমরণ। যেহেতু সহমরণ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ সেহেতু বিবাহ বা ব্রহ্মচর্যই কর্ম। কিন্তু এই ঘোর কলিকালে ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব নয়। আর ব্রহ্মচর্য যখন সম্ভব নয় তখন বিবাহই বিধেয়। বিদ্যাসাগর বলেছেন পরাশর সংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের সঙ্গে

কলিযুগের তুলনা হয় না। কারণ কলিযুগের মানুষ দুর্বল, আর দুর্বল মানুষের শাস্ত্র পরাশর সংহিতা। পরাশর তিন প্রকার পুত্রের যে উল্লেখ করেছেন ঔরসপুত্র, দত্তকপুত্র ও কৃত্রিমপুত্র, এখানে 'পৌণর্ভব' শব্দটির উল্লেখ না থাকার কারণে বিধবার গর্ভজাত সন্তান ঔরসজাত পুত্রেরই মর্যাদা পায়।

বিদ্যাসাগর একথাও অনুধাবন করেছিলেন যে শুধু বিধবা বিবাহ নিয়ে বাদবিতন্ডা চললেই তার মীমাংসা হবে না। বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্ধান পন্ডিত নিজের বাস্তব সামাজিক বোধ থেকে একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে শুধু শাস্ত্রীয় আলোচনার মাধ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচলন করা সম্ভব নয়। শাস্ত্র যতই বিধবা বিবাহের বিধান দেয় না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আইনের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হবে না। তাই তিনি শাস্ত্রের গন্ডি অতিক্রম করে তাকে একটি ক্রিয়াশীল পর্যায়ে আনতে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর 'বৃহন্নারদীয়' ও 'আদিত্যপুরাণের' আলোচনা করেও যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বেদব্যাস থেকে বচন সংগ্রহ করে বলেছিলেন যে বেদ ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বেদই গ্রহণীয়, পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে স্মৃতিকেই মান্যতা দিতে হয়। অতএব বৃহন্নারদীয়, আদিত্যপুরাণ এবং স্মৃতি শাস্ত্র পরাশর সংহিতার মধ্যে পরাশর সংহিতাই সর্ব প্রথম গ্রহণ যোগ্য।

১৭৭৬ সনে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত হলে সেই পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন এবং তিনি পত্রিকাটির পরের সংখ্যাতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন –

> "স্বামী মারা গেলে আমাদের দেশে মেয়েরা নিতান্তই অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। ঐ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তার বিবাহ করাই দরকার। তাছাড়া কন্যা বিধবা হলে পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজন যেমন দুঃখিত হয়ে থাকে তেমনি শঙ্কিত হয়েও পড়ে। বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলে তাই ঐ অবস্থা থেকে তারা বহুলাংশে মুক্তি পাবে।"[৯]

বিধবাবিবাহ প্রচলিত নয় বলে আমাদের সমাজ যে নানা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে এবং ধীরে ধীরে তা একদিন চরমে পৌঁছে যাবে সে বিষয়েও সম্পাদক মহাশয়

আলোচনা করেছিলেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বিধবা বিবাহ সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন তাতে আমরা তার সামাজিক মনোভাবাপন্ন ও বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিগনিত করতে পারি।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকটির বিরোধী ছিলেন নন্দকুমার কবিরত্নও। নন্দকুমারের মতে বিদ্যাসাগর যে সমস্ত শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধার করে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছেন সে সমস্ত বচনের উপর ভিত্তি করে বিধবা বিবাহকে সমর্থন করা যায় না। তিনি ভিন্ন যুগে ভিন্ন ধর্ম মানতে রাজী নন। তিনি বলেন পরাশর সংহিতায় কলিযুগের ধর্মের কথা যেমন আছে তেমনি সকলযুগের ধর্মের কথারও উল্লেখ আছে। আর 'নষ্টে মৃতে'বচনের মাধ্যমে বাগদত্তা কন্যার বিবাহের কথাই বলা হয়েছে। তাঁর মতে বিধবার গর্ভে যে সন্তানের জন্ম হবে তা ঔরসপুত্রের মর্যাদা পেতে পারে না। কারণ বিধবা কখনোও ধর্ম পত্নীর মর্যাদা পেতে পারে না। নন্দকুমার সকল যুগের ধর্ম একই এই কথাটি প্রতিষ্টিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন পরাশর তার স্মৃতি শাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের কথা বলেছেন। আর কলিযুগে 'নষ্টেমৃতে' বচন মান্যতা পায় না, কারণ হিসেবে বলেছেন পরাশর সংহিতায় 'নষ্টেমৃতে' বচনটি রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

বিধবাবিবাহের যারা বিরোধী তার সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে নষ্টেমৃতে বচনে শুধু বাগ্‌দত্তা কন্যার পতির কথাই বলা হয়েছে। নষ্টেমৃতে বচনে স্বামী মারা গেলে অন্য পতি গ্রহনের যে কথা রয়েছে তাঁরা তার ভিন্ন অর্থের কথাই বলেছেন। নন্দকুমারের মতে পরাশর সংহিতায় বিধবা বিবাহের কথা থাকলেও তা গ্রহণ যোগ্য নয়। মনু সংহিতাতে বিধবা বিবাহের কথা নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। মনুর মতে কন্যা দান একবারই হয়। তিনি বলেছেন যে স্বামী জীবিত বা মৃত যে কোনও মতে পত্নী এমন কোনও কাজ করবেন না যা প্রিয়জনক নয়। তাই নন্দকুমারের মতে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়, নষ্টেমৃতে বচনে অন্যপতি বলতে দেবরকে বোঝায় এবং বাগ্‌দত্তা কন্যার পতির মৃত্যু হলেও তাকে বিধবা হতে হয়। অর্থাৎ অন্যপতি বলতে বিধবা নারীর দেবরকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু পরাশর সংহিতায় নষ্টেমৃতে শ্লোকের অর্থ হল-

> "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয় তা হলে এই পঞ্চপ্রকার আপদে নারীর অন্যপতি গ্রহণ বিধেয়।"[১০]

পরাশর বচন আসলে কোনও বাগ্‌দত্তা সম্পর্কে নয়, পরাশর বচন বিবাহ বিষয়ে। পরাশর বচন মনুর বিরুদ্ধেও নয়। পরাশর সংহিতা বিধবাবিবাহের ও নিষেধ জারী করে না। কোনও দেশের আচার, শাস্ত্র অপেক্ষা মান্যতা পায় না। বিধবা বিবাহেও পিতার নাম গোত্র উচ্চারিত হবে।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তকের প্রতিবাদে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন একটি গ্রন্থ রচনা করেন, নাম 'বিধবাবিবাহবাদ'। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন যে বিধবাবিবাহ বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি বলে তিনি বিধবাবিবাহের আসল তথ্য বের করার চেষ্টা করেছিলেন। দীনবন্ধুর মতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকার কারণ সে যুগে বিধবা নারীকে 'পুনর্ভূ' বলা হতো। কিন্তু এই কলিযুগে এসেও বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র সম্মত বলে মানতে তিনি রাজী নন। তিনি বলেন বিধবাবিবাহ যদি সকল যুগেই শাস্ত্রীয় বা কল্যাণ জনক তবে কলিযুগে তা অপ্রচলিত বা অধর্ম বলা হয় কি কারণে। দীনবন্ধুর মতেও 'নষ্টেমৃতে' বচনে বাগ্‌দত্তা কন্যার ব্যাপারেই বলা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের আরও একজন প্রতিবাদী পাঠক পীতাম্বর সেন বিধবাবিবাহ নিষেধ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। দীনবন্ধু, নন্দকুমারের মত পীতাম্বর সেনও বলেছিলেন যে 'নষ্টেমৃতে' বচন কলিযুগের জন্য নয়। সেখানে বিধবা বিবাহের কথাও নেই। পরাশর বচন বাগ্‌দত্তা কন্যার বেলায়ই প্রযোজ্য। তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন–

> "যদি কলিযুগে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে পরাশর কলিযুগের পুত্রগননার স্থলে অবশ্যই পৌণর্ভবের গণনা করিতেন। গণনা করা দূরে থাকুক, পরাশর সংহিতাতে পৌণর্ভব শব্দই নাই। অতএব কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে পৌণর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গননা করিতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।"[১১]

পীতাম্বর বিদ্যাসাগরের এই কথার বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই বিধবাবিবাহ বিধি সম্মত নয়। একজন বিধবা স্ত্রী প্রথমা স্ত্রীর মর্যাদা পেতে পারে না আর সে কারণেই তার গর্ভজাত পুত্র ঔরসপুত্রের মর্যাদা পেতে পারে না। পীতাম্বর সেন বলেন যে কলিযুগের আরম্ভেই বিধবাবিবাহ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই কলিযুগে বিধবাবিবাহকে মান্যতা করা যায় না। তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলনের ফলে নানা অনর্থ ঘটনা ঘটতে পারে বলে যে যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন, সে গুলি বড়ই অযৌক্তিক এবং বাস্তবিক ভাবে তা বড়ই বেমানান।

রামধন দেবশর্মা যিনি কোড়কদি নিবাসী, তিনি বিধবাবিবাহ নিষেধক নামে যে পুস্তক রচনা করেছিলেন তাও বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের বিরুদ্ধেই। পুস্তকটির প্রথমেই লিখেছিলেন-

> "বিবাহিতা স্ত্রীর কলিযুগে পুরুষান্তরের সহিত পূণর্ব্বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ ইতি।"[১২]

বিদ্যাসাগর পৌনর্ভব পুত্র ও কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভের সন্তানের ক্ষেত্রে যা বলেছেন রামধন তার সঙ্গেও এক মত নন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন–

> "প্রথম 'পৌনর্ভব পুত্র' যদি যুগান্তরীয় হইল তবে বিধবার পুণর্ব্বিবাহ হইলে তাহাতে যে পুত্র হইবে সেই পৌনর্ভব, অতএব পৌনর্ভব পুত্রের ঘটক বিধবাবিবাহ ইহা স্বীকার করিলেও, যে যে যুগে পৌনর্ভব পুত্র বিহিত ছিল সেই সেই যুগেই বিধবাবিবাহের বিধি স্বীকার করা উচিত। পৌনর্ভব পুত্র কলিযুগে স্বীকার না করিয়া তৎপ্রতিপাদক মনুবচন বিধবাবিবাহ প্রতিপাদক বলিয়া কলিযুগে বিধবাবিবাহে প্রমাণোপন্যাস করা কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না।"[১৩]

বিদ্যাসাগর মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে-

> "বিবাহিতা বিধবা নারী উলূপীর গর্ভজাত অর্জুন পুত্র ঔরসপুত্র রূপে অভিহিত হয়েছিল।"[১৪]

বিদ্যাসাগর প্রমান করেছিলেন ব্যাসদেবের বচন অনুযায়ী আদিপুরাণ ও পরাশর সংহিতার মধ্যে পরাশর সংহিতাই মান্যতা পায়। এর বিরোধিতা করে রামধন প্রমান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে আদিপুরাণের বচনও একেবারে অমান্য করা যায় না।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে কলিযুগের এক মাত্র শাস্ত্র পরাশর সংহিতা। তার বিরোধিতা করে রামধন বলেছিলেন যে পরাশরের শাস্ত্রে ধর্ম বা কর্ম যদি মনুর শাস্ত্রের বিরোধী হয় তাহলে কলিযুগে তা আচরণীয় বলে মানা যাবে না।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে সমাজে নানা ব্যভিচার দেখা দিয়েছে। রামধনের মতে ব্যভিচার সধবারাও করতে পারে। কিন্তু রামধন এই মুক্তিকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন নি। কারণ একজন বিধবার বেলায় ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া যতটুকু সম্ভব, একজন সধবার বেলায় কিন্তু তা সম্ভব নয়।

বিধবাবিবাহের পক্ষে বলা হয়েছিল যে ঐ প্রথা প্রচলিত হলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রজাবৃদ্ধি আটুট থাকবে। এর প্রতিবাদে রামধন বলেছিলেন প্রজাবৃদ্ধি যদি ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত তাহলে বন্ধ্যা নারীর জন্ম হয় কেন। পুরুষ পুরুষত্বহীনতায়ইবা ভোগে কেন।

বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিদ্যাসাগর যে দুখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম পুস্তকের বিরোধিতা করে অনেকেই নানা পুস্তক রচনা করেছিলেন, তখনকার বহু বিরোধী পুস্তকের জবাব দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে, এবং সমস্ত জবাবই যুক্তি ও নিষ্ঠা সম্পন্ন। সমালোচকেরা প্রায় সকলেই রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন। একটি যুক্তির বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি দাঁড় করাতে গেলে যে বুদ্ধিমত্তা ও বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন তা সমালোকদের মধ্যে বিশেষ ছিলনা। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন-

> "অনেক প্রতিবাদ পুস্তকে কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তাছাড়া রক্ষনশীলতার বশবর্তী হবার জন্য ঐসব প্রতিবাদ কারীর অনেকে নিজ নিজ মতামত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতে শাস্ত্রীয় বচনের বিকৃতিও ঘটিয়েছিলেন"[১৫]।

বিদ্যাসাগরের বিরোধী সকলেরই কথা হল 'নষ্টেমৃতে' বচনে বাগদত্তা কন্যার বিবাহের কথাই বলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম পুস্তকে নিজের যে মত প্রকাশ

করেছিলেন, সেই মতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে 'নষ্টেমৃতে' বচনের মধ্যে পাঁচটি আপদের কথা বিধবা নারীর জন্যই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। তিনি একথাও বলেছেন যে স্বয়ং মাধবাচর্যত্ত পরাশরের বাচনকে বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর নারদ সংহিতার বচন উত্থাপন করে বলেছিলেন যে নারদ সংহিতার বচন থেকে একথা অনুমান করা যায় যে পরাশরের যে বচন তা বাগদত্তা কন্যার ক্ষেত্রে প্রোযোজ্য নয়। কেননা বাগদত্তা নারীর তো সন্তান থাকার কথা নয়। এখানে আমরা তাঁর যুক্তির বলিষ্ঠতা অনুমান করতে পারি। কিন্তু নানা বাদ্‌বিতন্ডার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষনীয় যে কিছু কিছু শাস্ত্র বিধবাবিবাহের বিধান দিয়েছে আবার কোনো শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি বিধবাবিবাহ নিয়ে যেমন মানুষে মানুষে বিরোধিতা ছিল তেমনি শাস্ত্রে শাস্ত্রেও বিরোধিতা ছিল।

বিদ্যাসাগরের বিরোধিরা দাবী করেছিলেন যে 'নষ্টেমৃতে' বাচনকে মাধবাচার্য কলিযুগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়না বলেছেন কারণ আদিত্যপুরাণে বিধবা নারীর বিবাহের কোনো বিধি নেই, তাই পরাশরের বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় বচন কলিযুগে মান্যতা লাভ করতে পারেনা। কিন্তু একটা কথা লক্ষনীয় যে মাধবাচার্য পরাশর সংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র বলে মেনে ছিলেন, তাই পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচন কলিযুগেই প্রয়োগ হবে। বিদ্যাসাগর আরও বলেন যে মাধবাচার্য আদিপুরাণের যে বচনকে উদ্ধার করে পরাশর সংহিতাকে উপেক্ষা করেছেন তা আসলে আদিপুরাণের বচন নয়। সুতরাং বিরোধী সমালোচকেরা মাধবাচার্যের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাদের মুখের উপর উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন।

বিরোধিপক্ষের মতে পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচন মনু স্মৃতি বিরোধী, কারণ মনু বিধবাবিবাহকে মানেন না। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে তার জবাব দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতে মনু সংহিতা সত্য যুগের শাস্ত্র, কিন্তু কলিযুগে যে কোনো শাস্ত্র থাকবে না তা তো হতে পারে না। বিদ্যাসাগর এও বলেছেন যে মনু বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না, কারণ মনু সংহিতায় যে 'পৌণর্ভব' শব্দ প্রয়োগ করেছেন তা বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তানকেই বুঝিয়েছেন।

মনু ও পরাশর কেউই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন নি। তবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা নারীকে 'পুনর্ভূ' বলেছেন এবং তার সন্তানকে পৌণর্ভব বলেছেন। কিন্তু কলিযুগে কোন প্রয়োজন নেই বলে পরাশর পৌণর্ভব শব্দের প্রয়োগ করেন নি।

বিদ্যাসাগর বিরোধি প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে পরাশর বিধবার যন্ত্রনাকে দন্ড বলে আভিহিত করেছেন, তাই যদি দন্ডি হয়ে থাকে তবে তিনি বিধবাবিবাহের বিধান দেন কোন অর্থে। প্রসন্নকুমার বলেছেন যে–

> "স্বামী ক্লীব হলে স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারে পরাশর সে কথা বলতে পারেন না। কেননা তিনি ক্ষেত্রজপুত্রের বিধান দিয়েছেন; স্বামী ক্লীব হলে অপরকে যখন পুত্রার্থে নিয়োগ করা যেতে পারে তখন ক্লীব স্বামীর স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করবে কেন।"[১৬]

বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমারের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

> "বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করে তাহলে তাকে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রনা পেতে হবে না বটে, তবে বিবাহের আগে পর্যন্ত কিছুদিন ঐ যন্ত্রনা তাকে ভোগ করতেই হয়। কাজেই যে ভাবেই হোক না কেন নারীর কাছে বৈধব্য নিতান্ত বেদনাদায়কই হয়ে ওঠে। অতএব বৈধব্যদশাকে দন্ড বলা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহের বিধি দেওয়া পরাশরের পক্ষে অসঙ্গত হয়েছে সে কথা বলা যায় না।"[১৭]

বিদ্যাসাগর আরও বলেছেন যে পরাশর পুত্র প্রকরণের যে কথা উল্লেখ করেছেন তা ক্ষেত্রজপুত্রের কথা নয়। আর নষ্টেমৃতে বচন যে কোনো হিন্দু রাজার আমলে পরাশর বলেছিলেন তাও মিথ্যা, কারণ হিন্দু রাজার অনেক আগেই মাধবাচার্য এই বচনটিকে পরাশর বচন বলে মেনে নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আরও একজন সমালোচক কালিদাস মৈত্র বলেছিলেন যে 'নষ্টেমৃতে' বচনে পরাশর নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহের বেলায় প্রয়োগ করেন নি। বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন, কালিদাস মৈত্র যে 'বিধিয়তে'র জায়গায় অ-বিধিয়তে বলতে চাইছেন তা হতেই পারে না, কারন 'পতিরণ্যে বিধীয়তে' বচনের পরে

যে বচনগুলি রয়েছে তা যদি ঠিক ঠিক বিচার বিশ্লেষিত হয় তাহলে এস্থলে অ-বিধীয়তে হতে পারে না। এটা বানানের কোনো ভুল নয়।

নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁর কিছু সহকারী বলেছিলেন যে পরাশর সংহিতায় শুধু কলিযুগের কথাই বলা হয় নি অন্য যুগের কথাও তাতে আছে, কিন্তু বিধবাবিবাহ শুধু সত্যযুগের ক্ষেত্রে প্রচলিত কলিযুগে নয়। পরাশরের কয়েকটি আচরণ অন্যান্য শাস্ত্র নিষিদ্ধ করেছিল তাই পরাশর সংহিতায় শুধু কলিযুগের কথা নয় অন্য যুগের কথাও আছে। তার জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে, পরাশর সংহিতার কয়েকটি বিধি যদি অন্যপুরাণের কলিযুগের বিধানের সাথে মিল নাও থাকে তবুও বলা যায় না যে পরাশরের বিধান কলিযুগে পালনীয় হবে না। মনু সংহিতায় তো নানা যুগে নানা ধর্মের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোন যুগে কোন ধর্ম তা তো বলা হয় নি, কিন্তু পরাশর সংহিতায় যুগ অনুযায়ী ধর্ম নির্ধারিত আছে।

বিধবাবিবাহের আরও একটি বিরোধী বক্তব্য ছিল যে কন্যাদান একবারেই হয়, একবার দান করার পর তার উপর পিতার আর কোনও অধিকার থাকেনা, তাই বিবাহিত কন্যাকে আবার দান করা যায়না। এই বক্তব্যের জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে বিধবা কন্যা হলেও তাকে পিতাই আবার দান করতে পারেন, কারণ কন্যাদান তো হলো বাচনিক দান, এই দান তো আর ভুমি দান বা গরু দান করার মত স্বত্ব ত্যাগ করে দান করা নয়। বিদ্যাসাগর কাত্যায়নের বচন দেখিয়ে বলেছিলেন যে, কাত্যায়নের বাচনেও বিবাহিতা কন্যাকে আবার দান করার বিধি আছে, পিতা কন্যাকে একবার দান করার পর যদি আরেকবার দান করতে পারতেনই না, তাহলে কাত্যায়ন এমন বিধি দিতে যাবেন কেন। আর বিধবা কন্যার দানের উদাহরণ তো মহাভারতেও পাওয়া যায়। মহারাজা ঐরাবত তার বিধবা কন্যাকে অর্জুনের কাছে দান করেছিলেন। বিধবা কন্যা দান করার সময় কোন গোত্র উচ্চারিত হবে, এই প্রশ্নের জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে গোত্র বংশাবলীর পরিচয় তাই বিধবা কন্যা দান করার ক্ষেত্রে পিতার গোত্রই উচ্চারিত হবে এবং পিতাই তাকে দান করবেন।

অনেকে বিধবাবিবাহকে দেশাচার বিরুদ্ধ বললে বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা প্রথম পুস্তকের যুক্তি অপেক্ষা আরও জোরালো ছিল।

নন্দকুমার কবিরত্ন এবং হারাধন বিদ্যারত্নের 'বৈধব্য ধর্ম্মোদয়' পুস্তকেও বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর জবাবে মহাভারতের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন যে বিবাহিতা বিধবা উলুপীর পুত্র অর্জুনের ঔরসপুত্রের মর্যাদা পেয়েছিলেন। নন্দকুমার ও হারাধন বিদ্যাসাগরকে দেশাচার বিরোধী বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর জবাবে বলেছিলেন যে বেদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে স্মৃতি গ্রাহ্য হয় না, তেমনি স্মৃতির সঙ্গে বিরোধ ঘটলে দেশাচারকে গ্রাহ্য করা যাবেনা। তিনি বলেছিলেন-

> "যখন স্মৃতি শাস্ত্রে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি আছে তখন দেশাচার বিরুদ্ধ বলিয়া তাহার অকর্তব্যত্ব ব্যবস্থাপন করিতে উদ্যত হওয়া শাস্ত্র কর্ত্তাদিগের মতের নিতান্ত বিপরীত হইতেছে।"[১৮]

বিধবাবিবাহের বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' গ্রন্থে তার প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শাস্ত্র থেকে যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তার মতে যাহা যুক্তিসঙ্গত তাই শাস্ত্র, আর অযৌক্তিক সব অশাস্ত্রীয়। তিনি বলেছিলেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে না থাকলেও প্রচলিত হওয়া উচিত কারণ তা যুক্তি সঙ্গত।

বিদ্যাসাগরের বিরোধী শ্যামাপদ বলেছিলেন যে বিধবার গর্ভের সন্তান কখনও ঔরসপুত্র হয়না। তার মতেও নষ্টেমৃতে বচন কলিযুগের জন্য নয়। পরাশর সংহিতা শুধু কলিযুগেরই নয় সকল যুগের শাস্ত্র। শ্যামাপদ যদিও ন্যায়ভূষন ছিলেন, তবুও বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা আলোচনায় তিনি বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে থাকলেও সে বিষয়ে কোন যুক্তিবাদের পরিচয় দিতে অক্ষম ছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছেন বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকলে ভ্রুন হত্যা ঘটবে, শ্যামাপদ বিরোধিতা করে একটি অবাস্তব যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকলেও ভ্রুন হত্যা ঘটবে। কারন বিধবারা নিজের ইচ্ছামতো পতি গ্রহণ করবেন তার ধনশক্তি ও রতিশক্তি দেখে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে ব্যভিচার যে হচ্ছে না একথা তিনি বলেন নি। তার মতে যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অবহেলা থাকবে এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করার ফলে প্রথম স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের কষ্ট হবে। তবে বিধবার অন্য কারণ যে বাল্য বিবাহ তা তিনি স্বীকার করে বাল্যবিবাহ নিবারণ অতি আবশ্যক বলে ঘোষণা করেছিলেন।

ভুবনেশ্বর মিত্রের 'হিন্দুবিবাহ সমালোচন' দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। তিনি বিধবাবিবাহ নামক একটি প্রবন্ধে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে বিধবাবিবাহ বৈদিক কালেও ছিল এখনও থাকবে। মনু বিধবার সন্তানকে পৌণর্ভব বলেছেন। তিনি বিধবার পুত্রকে দশম স্থান দিয়েছিলেন, যাজ্ঞবল্ক তাকে সপ্তম স্থান দিয়েছিলেন, বিষ্ণুও বশিষ্ট দিয়েছিলেন চতুর্থ স্থান আর পরাশর সেই সন্তানকে ঔরসজাত সন্তানের স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু ভুবনেশ্বর সব বিধবার বিবাহকে সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে যদি কোনো নারীর ভোগ লালসা অতৃপ্ত থাকে বা সন্তান হীন থাকে তবেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে। বিধবাবিবাহের বিষয়ে ভুবনেশ্বর বলেছেন যে বিধবার পাত্র অভিভাবক বা বন্ধুবান্ধবই ঠিক করে দিতে পারে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার একটি সংখ্যায় 'দ্বিতীয়বার বিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক নিঃসন্দেহে রক্ষনশীল সমাজের মানুষ। তিনি বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেন এবং কারণ হিসেবে বলেন যে বিধবার বিবাহ হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তিনি বিধবার দুঃখের প্রতি উদাস। তাঁর মতে যদিও কোনো এক যুগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন আর তার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপারও লক্ষনীয় যে প্রাবন্ধিক বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন কিন্তু কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে তাকে আবার বিবাহ করতে প্রাবন্ধিকের কোনো অমত নেই। এখানে নারীপুরুষের একটা বৈষম্য আমরা দেখতে পাই। এখানে প্রাবন্ধিক বিধবা নারীর প্রতি যে ধরনের চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তা মোটেই সুবিধাজনক নয়।

১২৯১ সালে 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিনী সভা'র চতুর্থ অধিবেশনে নবদ্বীপ থেকে আগত স্মার্তধর্মের শ্রেষ্ট পুরুষ নাম ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন একটি ভাষণ পাঠ করেন যা ছিল বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে। রক্ষনশীল সমাজ নেতারা সেই ভাষণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ করলে বিদ্যাসাগর তা পাঠ করে 'ব্রজবিলাস' পুস্তকটি রচনা করেছিলেন ছদ্মনামে। এই পুস্তকে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক দেওয়া ভাষণের প্রথম ও শেষ ভাগই আলোচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। কারণ এই দুই অংশেই বিধবা বিবাহ বিষয়ে ব্রজনাথের সম্পূর্ণ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজনাথের ভাষনে তেমন কোনো নতুনত্ব না থাকার কারণে বিদ্যাসাগরের জবাবেও তেমন কোনো নতুনত্ব নেই।

যদিও বিধবা বিবাহ আইন করে প্রচলিত হয়েছিল তবুও রক্ষনশীল সমাজ তার বিরোধিতাই করে গেছে। আর তাই নলডাঙায় চেঙনা রাজা যখন বিধবাদের বিবাহ দিতে আরম্ভ করলেন তখনই বিধবাবিবাহের বিপক্ষে ভাষণ দেওয়ার জন্য ব্রজনাথকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। আর এই ভাষণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ভাইপো ছদ্মনামে বিদ্যাসাগর কলম হাতে নিয়েছিলেন।

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে 'নবজীবন' পত্রিকায় বিধবাবিবাহ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, প্রাবন্ধিক ছিলেন রামদাস সেন। রামদাস বিধবাবিবাহের পক্ষ বিপক্ষ বিচার করার উদ্দেশ্যে পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। তিনি সমস্ত ধরনের বিধি উত্থাপন করে দেখতে চেয়েছিলেন যে বিধবাবিবাহের পদ্ধতি প্রাচীন কালে কি রূপ ছিল। রামদাস প্রবন্ধটিতে তাঁর নিজের যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাতে বোঝা যায় যে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতি ছিলেন না।

সে কালে কলকাতার একটি নামী সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল সাবিত্রী লাইব্রেরী। সেই লাইব্রেরীতে ১২৯২ সনের একটি অধিবেশনে শ্যামাসুন্দরী দেবী বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির নাম 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না'। শ্যামাসুন্দরী বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্যের পক্ষপাতি ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ মূলক বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন-

> "বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় প্রমান দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই যে বিবাহ করাই বিধবাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম; না করিলে কোন রূপ প্রত্যবায় আছে; এবং ভরসা করি শাস্ত্রেও মহর্ষি পরাশরাদি মুনি ঋষিগন বিধবাগনের বিবাহপেক্ষা যেরূপ ব্রহ্মচর্যেরই অধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাদৃশ ব্রহ্মচর্য পালনই শ্রেষ্ট মনে করেন।"[১৯]

এই উক্তি থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে শ্যামাসুন্দরী বিধবার ব্রহ্মচর্যেরই পক্ষপাতি ছিলেন। বিধবাবিবাহের পক্ষে যে আইন পাশ করা হয়েছিল তিনি তারও বিরোধি ছিলেন। তিনি বলেন যে, আইন দ্বারা বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া যদি বাধ্যতামূলক নয়, তবে এই আইন বিধবাদের লোভী করে দিয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে, স্বামী মারা যাওয়ার পর নারী যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করবে তা কেবল নীচু

জাতির জন্যই, কারণ কোনো উচ্চজাতির নারী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না। এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা শ্যামাসুন্দরীর সংস্কারধর্মী মানসিকতার পরিচয় পাই।

অক্ষয়চন্দ্র বিধবাবিবাহের যুক্তি দিতে গিয়ে হিন্দুরমনীর পতিব্রতার খুব প্রশংসা করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যে যুক্তি অপেক্ষা আড়ম্বর বেশি ছিল, ভাবাবেগ বেশি ছিল, কারণ তিনি বাগাড়ম্বর ও ভাবাবেগ দিয়ে তাঁর রক্ষনশীল মনোভাবকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের বক্তৃতা শোনে বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি ছিলেন প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি, তিনি অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র বলেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর আত্মার মিলন থাকে, স্বামী বিদেশে যদি থাকে তবে স্ত্রী যেমন আবার বিবাহ করতে পারে না তেমনি স্বামী মারা গেলেও স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারবে না। বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন বিদেশে যাওয়া আর মারা যাওয়া এক কথা নয়। বিপিনচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ, জীবন সকল বিষয়েই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উপযুক্ত জবাব দিতে তিনি পিছপা হন নি।

অক্ষয়চন্দ্রের আরও একজন অজ্ঞাত নামা প্রতিবাদী ছিলেন যিনি 'প্রতিবাদ নবজীবন সম্পাদক ও বিধবাবিবাহ' নামক পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিবাদী লেখকের নাম গুপ্ত ছিল। অক্ষয়চন্দ্র বলেছিলেন যে বিধবা নারী আবার বিবাহ করতে চায় তার নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করতে। প্রতিবাদকারী অক্ষয়চন্দ্রের কথার বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে-

> "প্রকৃত ভালোবাসা না থাকবার জন্যে স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী যদি বিবাহ করতে চায় তাহলে তা দোষের হবে না।"[২০]

তাঁর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর ব্রহ্মচর্যই গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু আমাদের দেশে সেই ধরনের বিধবার সংখ্যা খুবই কম।

এখানে একটা জিনিস লক্ষনীয় যে প্রতিবাদকারী অক্ষয়চন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন ঠিকই, তাকে প্রগতিশীল বলেও মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে ততটা উদার ছিলেন না।

সমাজ দীপিকায় ১২৯২ এর কার্তিক মাসে 'বিধবাবিবাহ দেবদূত ও সনৎকুমার কথোপকথন' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই রচনাটিতে রচনাকার দেবদূতের মুখে বলিয়েছিলেন যে বিধবাবিবাহ কোনো কোনো শাস্ত্র মতে যেমন বিধি নিয়মের মধ্যে পরে তেমনি কোনো কোনো শাস্ত্র বিধবাবিবাহের নিষেধও জারি করে। রচনাকারের মতে একটি শাস্ত্র তখনই কার্যকারী হয় যখন দেশ কাল ও পাত্র তাকে মেনে নেয়। তিনি বলেন যে যদিও কোন কালে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন আর তা উচিত নয়।

বিদ্যাসাগর অর্জুন ও নাগ কন্যার বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন যে শুধু শাস্ত্রই নয় সমাজেও তখন বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের বেশ কয়েক বৎসর পর বিদ্যাসাগরে বৃদ্ধ বয়সে মধুসূদন স্মৃতিরত্ন 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বৃদ্ধ অবস্থায়ও সেই পুস্তকের জবাব দিতে বিতর্কে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি মধুসূদনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে 'রত্নপরীক্ষা' নামে পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। মধুসূদন বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল বক্তব্য রেখেছিলেন তা কোনো নতুন ঘটনা না হলেও বিদ্যাসাগর তার জবাব দিয়েছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলেছিলেন যে নষ্টেমৃতে বচনে 'পতিরণ্যেবিধীয়তে'র মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহের কথা নেই। বিধবাবিবাহ কোনো বিবাহের মর্যাদা পায় না। বিবাহের যে মন্ত্র তাও শুধু কন্যার বিবাহেই প্রয়োগ করা হবে। আর বিধবা তো কন্যা নয়। বিধবার যদি বিবাহের নিয়ম থাকত তাহলে মন্ত্রেও তা উচ্চারিত হত। জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন-

> "কন্যা শব্দে কেবল কুমারী বুঝায়, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। সরল চিত্তে বুদ্ধিপরিচালনাপূর্বক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় অনায়াসে অবগত হইতে পারিতেন, কন্যাশব্দ কুমারী ভিন্ন অন্য অন্য অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।"[২১]

কন্যা বলতে কুমারীকে বোঝায় কিন্তু বিশ্বকোষে তার অর্থ যেমন কুমারীকে বোঝায় তেমনি নারীকেও বোঝায়। স্মৃতিরত্নের বিরোধিতার জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর আরও বলেছিলেন যে–

> "যদি ব্রাহ্ম, আর্য, প্রাজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব অথবা রাক্ষস, বিবাহ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে, তাহা হইলে, বিধবাবিবাহ, ঐ ঐ নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হইলে, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট না হইবেক কেন। দ্বিতীয় বচনে কন্যা শব্দ নাই, সুতা শব্দ আছে। সুতা বিবাহিত কি অবিবাহিত তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং এই বচনে যে নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে সুতার বিবাহ সম্পাদিত হইলে, সুতা অবিবাহিতাই হউক, আর বিবাহিতাই হউক, দৈব বিবাহ বলিয়া উল্লিখিত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অষ্টম বচনে, কন্যা সুতা প্রভৃতি কোনও বিশেষ্যশব্দের প্রয়োগ নাই; কেবল স্ত্রীলিঙ্গের তিনটি বিশেষপদ প্রযুক্ত দৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, কি অবিবাহিতা, কি বিবাহিতা, নারী মাত্রেই বিবাহে এই বচনে খাটিবার বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।"[২২]

মধুসূদন মনুর 'নোদ্বাহিকেষু' থেকে বচন উদ্ধার করে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সকল বিরোধিতার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মধুসূদনের বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ পুস্তকটি পাঠ করে, মধুসূদনকে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং পত্রে তিনি মধুসূদনের বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে দেওয়া সকল যুক্তি অমূলক বলে দেখিয়েছিলেন। এই পত্রটি বিতর্ক রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মর্যাদার দাবিদার। মহেশচন্দ্র মধুসূদনের বিরোধী বক্তব্যের নানা ভুল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন পত্রটিতে। মহেশচন্দ্র একথাও বলেছিলেন যে মধুসূদন নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে শাস্ত্রের বাধ্যতামূলক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' প্রকাশিত হয় ১২৯২ সনে। তিনি বিধবা নারীর জন্য বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য দুটিকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে ব্রহ্মচর্য পালনের যে বিধান শাস্ত্রে দেওয়া আছে তা একজন বিধবা নারীর পক্ষে

পালন করা ক্ষতিকর। বিরোধীদল ব্রহ্মচর্যকে নিষ্কাম বললে তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

"ব্রহ্মচর্য ধর্ম্ম ও নয়, নিষ্কাম কর্ম্মও নয়।"[২৩]

অক্ষয়চন্দ্র ব্রহ্মচর্যের আদর্শ সম্পর্কে যা বলেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তা মেনে নেন নি। তিনি বলেন ব্রহ্মের সেবাই যদি ব্রহ্মচর্য হয় তা হলে বিবাহিতা নারীও ব্রহ্মের সেবা করতে পারে। তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থন কারীই ছিলেন। তাঁর মতে বিধবাবিবাহ প্রশস্ত।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ মূলক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমালোচক প্রসন্নকুমার শর্মা। তাঁর 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ' ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য বিরোধী সমালোচকদের মতো প্রসন্নকুমার ও মনুস্মৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে যুগানুযায়ী কোন শাস্ত্রই নেই। আর মনু শাস্ত্র সর্বযুগের। তিনি বৃহত পরাশর সংহিতার সাহায্যে এবং বিদ্যাসাগর লঘু পরাশর সংহিতার সাহায্যে বিধবাবিবাহ বিষয়ক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রসন্নকুমার বলেন যে বৃহৎ পরাশর সংহিতায় নষ্টেমৃতে বচনটি নেই। তাই মনু সংহিতার সঙ্গে বৃহৎ পরাশর সংহিতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তিনি খুজে পেয়েছিলেন। তিনি গোত্র বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, গোত্র পরিচয় যদি বংশ পরিচয় হয়ে থাকে তাহলে বিবাহের পর তো কন্যা পতি গোত্র পেয়ে থাকে। তাই দ্বিতীয় বিবাহে তো পিতার গোত্র উচ্চারিত হতে পারে না। কারণ একবার পিতার গোত্র থেকে বেরিয়ে গেলে তাকে আবার পিতার গোত্রে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে দুই পতির ঔরসে যদি দুই সন্তানের জন্ম হয় তাহলে শ্রাদ্ধ শান্তির বেলায় পুত্র কোন গোত্র বলবে।

প্রসন্নকুমারের 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ' এর প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর রচনা করেছিলেন 'রত্নপরীক্ষা'। প্রসন্নকুমার বিদ্যাসাগরের 'রত্নপরীক্ষা'র প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে বিধবা বিবাহ খুবই নিন্দার বিষয়। বিদ্যাসাগর কন্যাশব্দের অর্থ 'কৃত' বললে প্রসন্নকুমার তা মেনে নেন নি। তিনি কন্যা বলতে শুধু কুমারীকেই বুঝেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে তন্ত্রবচন উদ্ধার করলে প্রসন্নকুমার তা স্মৃতিবিরুদ্ধ বলেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের রত্নপরীক্ষার আরও একটি প্রতিবাদী পুস্তক 'রত্নপরীক্ষা প্রতিবাদ'। শিরোনাম পৃষ্ঠা না থাকায় রচয়িতার নাম জানা যায় নি। বিদ্যাসাগর রত্নপরীক্ষায় অথর্ববেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু রচয়িতা এর কোনো বচনকেই বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন নি। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে তন্ত্রবচন তাঁর রত্নপরীক্ষায় আলোচনা করেছিলেন, রচয়িতা সেই বচন কে তন্ত্র বিরোধী বা বেদ বিরোধী বলেছিলেন। রচয়িতা আরও বলেন যে বিবাহিতা নারী কন্যা হতে পারে না, আর বিবাহ একমাত্র কন্যারই হয়ে থাকে।

যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামনি ও তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে নষ্টেমৃতে বচনটি পরাশরের নয়। নারদ সংহিতায় বা আদিত্যপুরাণের মতে কলিযুগে বিধবা বিবাহ হতে পারে না। বৃহৎ পরাশর সংহিতায় ও বিধবাবিবাহের উল্লেখ নেই। তিনি সম্পূর্ণভাবে পুরাণকে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং বলেছিলেন–

> "কলিতে বিধবাবিবাহকে শিষ্টরীতি বলে মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"[২৪]

মনু যে বিধবাবিবাহের পক্ষে ছিলেন না একথাও তিনি জানান।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ একথা অনেকেই তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ একটি নতুন মত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

> "বেদে বিধবাবিবাহের কথা নেই তা নয়, তবে সেই বিবাহ ঘটাবার অনুকুল শর্তপূর্ণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই জন্যে ঋষিগন তার বিধান দিয়েও তাকে চালু করেন নি। দুই একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এই যা।"[২৫]

বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হয় নি। সেই যুগের একটি সাময়িক পত্র লেখে যে–

> "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও ভারতবর্ষে পরিগৃহিত নহে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা ও উৎসাহে বঙ্গদেশে কখনও কখনও ইহার অনুষ্ঠান দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সমাজে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া

কোনও স্থানেই গ্রাহ্য হয় না। এতৎ ব্যাপার অনুষ্টাতৃগন সমাজ চ্যুত হইয়া মর্যাদাভ্রষ্টরূপে বসতি করে।”[২৬]

‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ যখন বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন সে সময়ে নারী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া বিস্তার লাভ করতে পারেনি ঠিকই তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়েছিল। অল্পবয়সে স্বামীহারা বিধবাদের অন্তপুরের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে বন্দী করে রাখার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল আমাদের তথাকথিত স্মৃতিশাস্ত্র নির্ভর সমাজ, সমাজ নির্ধারিত বিধি নিয়ম, সেই বিধি নিয়মটাকে বিদ্যাসাগর আঘাত করেছিলেন বলেইতো ধীরে ধীরে নারী সমাজ একটু বাইরের আলো দেখার সুযোগ পেয়েছিল। বিধবাবিবাহ চালু হওয়ার পর অন্তত কত নাম না জানা বাল্য বিধবা হয়তো উপকৃত হয়েছিলেন, কত বিধবা উপযুক্ত স্বামী পেয়েছিল যে স্বামী সেই সব নারীদের এগিয়ে চলার ইচ্ছাকে হয়তো কুর্নিশ করেছিল এবং ধীরে ধীরে আপন ভাগ্য জয় করবার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগের নারীসমাজ।

তথ্যসূত্রঃ

1. সমকালে বিদ্যাসাগর, স্বপন বসু, পৃষ্ঠা ১৭।

2. ঐ পৃষ্ঠা ১৭।
3. ঐ পৃষ্ঠা ১৮।
4. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৫৬৯।
5. ১৯ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ১৩৭।
6. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ২৩৯।
7. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৫৬৯।
8. ঐ পৃষ্ঠা ৫৭৩।
9. ১৯ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ১৪১।
10. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ২৫৫।
11. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৫৭৪-৫৭৫।
12. ১৯ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ১৪৭।
13. ঐ পৃষ্ঠা ১৪৮।
14. ঐ পৃষ্ঠা ১৪৮।
15. ঐ পৃষ্ঠা ১৫০।
16. ঐ পৃষ্ঠা ১৫৬।
17. ঐ পৃষ্ঠা ১৫৬।
18. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৬৮০।
19. ১৯ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ১৮০।
20. ঐ পৃষ্ঠা ১৮৩।
21. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৯৭৩।
22. ঐ পৃষ্ঠা ৯৮৩।

23. ১৯ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ১৯১।
24. ঐ পৃষ্ঠা ১৯৯।
25. ঐ পৃষ্ঠা ১৯৯।
26. সমকালে বিদ্যাসাগর, স্বপন বসু, পৃষ্ঠা ৪৮।

****